মূলপাতা

নানুভাই

Sharif Abu Hayat Opu

2021-12-18 20:42:25 +0600 +0600

4 MIN READ

আমার নানী যখন মারা যান তখন আম্মার বয়স ২ বছর হয়নি। আর নানা যখন মারা যান তখন আম্মা ক্লাস টুতে পড়েন।

বহু বছর পরে আম্মা যখন মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তখন আমার বয়স ১৮ মাস।

গজারিয়ার গোঁসাইরচর নামের এক জায়গায় এক বাড়িতে আমাদের নিয়ে আম্মা লজিং থাকা শুরু করলেন, কলেজের বেতন খুবই কম ছিল—সম্ভবত ৬০০ টাকা। এই বাসার মালিকদের আম্মা খালাম্মা-খালুজান বলে ডাকতেন।

আমরা ডাকতাম নানুসোনা আর নানুভাই বলে। তাঁদের সন্তানদের পড়াবেন—তার বিনিময়ে আম্মা থাকবেন—এমন একটা চুক্তি ছিল সম্ভবত।

অবশ্য চুক্তির বাইরেও অনেক কিছু হয়। আম্মা আমাকে রেখে কলেজে যেতেন। নানুসোনার কাছে থাকতাম। নানুভাই মাঠে কাজ করতেন। পাট পঁচাতেন। পাট জাগ দিতেন। আমি দেখতাম।

আমার মতো আমার ছোটভাইয়ের জন্মও যশোরে। ছোট্ট ঐশিকে নিয়ে আম্মা ফেরত এলেন কর্মস্থানে। দুধের বাচ্চা—সকালে খাইয়ে দিয়ে আম্মা কলেজে যেতেন।

কিছুক্ষণ পরই ওর ক্ষুধা লাগত। নানুভাই নৌকায় করে ঐশীকে নিয়ে কলেজে যেতেন—মা, বাচ্চাটাকে একটু খাইয়ে দাও। আম্মা ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে খাইয়ে দিতেন ওকে। নানুভাই ডিঙি নৌকা চালিয়ে বাসায় ফিরতেন।

কোনো বাড়িওয়ালা তার ভাড়াটিয়ার জন্য এমন করে?

যখন আমার বয়স সাড়ে তিন বছর তখন আম্মা গজারিয়া থেকে নরসিংদি সরকারী কলেজে বদলি হয়ে যান।

আমরা ঢাকায় মুহাম্মাদপুরে থাকা শুরু করলাম। আম্মা প্রতিদিন বাসা থেকে বাসে করে নরসিংদি গিয়ে ক্লাস নিয়ে আবার ফেরত আসতেন। ১৯৮৭ সালের কথা।

গজারিয়া থেকে বদলি হয়ে গেলেও আমার নানাবাড়ি গজারিয়াই থেকে গেল। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম—মামাবাড়ি যশোর, নানাবাড়ি গজারিয়া।

প্রত্যেক বছর এক বা দুইবার গজারিয়া যেতাম বেড়াতে। শীতে পিঠা খেতে। বর্ষায় মাছ খেতে। বাড়ির সামনে একটা পুকুর ছিল। সেখানে কই মাছ পাওয়া যেত। কই মাছের তেলে মাছ ভাজতেন নানুসোনা।

নানুভাই কুপির আলোয় মাছ বেছে দিচ্ছেন, আমাকে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন মনে আছে।

তখন একটু বড়—ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ি।
যথারীতি আমরা গজারিয়া বেড়াতে গেছি।
বৃষ্টির মধ্যে আমি আর ঐশী গাঙে গেছি গোসল করতে।
বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ভীষণ বড়—আমরা পানির তলে শরীর ডুবিয়ে রেখেছি। মাথা তুললেই বর্শার মতো বিঁধছে।
পানির তলার দুনিয়ার শব্দ শুনছি।

পানিতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ।
পোকার ডাকের শব্দ।
মাছের নড়ার শব্দ।
অপু-ঐশী!
এই শব্দ এল কোথা থেকে?
নানুভাই ডাকছেন।
মাথায় ছাতা।
বাসায় গেলে আম্মা মারবেন—তাই আমাদের গাঙ থেকে ডাকতে নানুভাই স্বয়ং চলে এসেছেন।

১৯৭১ সালে নানুভাইকে পাকিস্তানি মিলিটারি গুলি করেছিল। তিনি গুলি খেয়ে গাঙের ধারে পড়ে ছিলেন। মিলিটারি চলে যাওয়ার পরে মানুষেরা আবিষ্কার করল, তিনি বুকে গুলি খেয়েও মরেননি। পরে উনাকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফুসফুসে অপারেশন করে গুলি বের করা হয়। তিনি আরো পঞ্চাশ বছর হায়াত পান। সাদা সফেদ দাড়ি ছিল আমার নানুভাইয়ের। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তেন। তিনি হায়াত পেয়েছিলেন বলেই আমি নানুভাইয়ের ভালোবাসাটা পেয়েছিলাম।

গতকাল নানুভাই আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। কাল জানাজায় যেতে পারিনি, যখন খবর পেয়েছিলাম অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজ কবর জিয়ারাত করে আসলাম। কান্নায় চোখ টলমল।

১২ বছর পর আজ আমি আমার শৈশবের গ্রামে ফিরে গিয়েছিলাম। নানুভাইয়ের দেওয়া জমির ওপর গোসাইরচর মধ্যপাড়া জামে মাসজিদে মাগরিবের সলাত পড়লাম।
কত স্মৃতি!
মনের মধ্যে কত রকমের আবেগের ঢেউ—বলে বোঝানো যাবে না।

ভীষণ একটা অপরাধবোধ কাজ করছে।
গত কয়েকবছর ধরে নানুভাইয়ের সাথে দেখা হয় না, বেশ কয়েকবার ভেবেছি দেখা করব।

এখন আফসোস হচ্ছে।
কান্না টলমল চোখে আল্লাহকে বলছি মালিক, আপনি জান্নাতে নানুভাইয়ের সাথে এই না হওয়া দেখা করার কাফফারা আদায় করার তাওফিক দিয়েন। ওখানে যেন নানুভাইয়ের সাথে দেখা হয়।
দুনিয়াটা নশ্বর—আমরা সবাই মরে যাব।

আমার সব প্রিয় মানুষগুলোর জন্য আমি এই দু'আ করি—আল্লাহ আমাদের জান্নাতে একসাথে থাকতে দিয়েন।
অনন্তকালের জন্য।
দুনিয়াতে আমাদের ছিড়ে যাওয়া রিশতাগুলোকে আপনি জান্নাতে জুড়ে দিয়েন মালিক।